শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হোক সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়ন

প্রাণিজগতে শুধু মানুষের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনিয়তা দেখা দেয়। একমাত্র শিক্ষাই মানুষকে অন্য প্রাণিজগৎ থেকে পৃথক করেছে। জীবনকে অর্থবহ করতে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে 'মানুষের মতো মানুষ' করে গড়ে তোলার প্রয়োজন পড়ে। এই শিক্ষা যে-কোনো জাতি গঠনের মূল ভিত্তি, জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি। সুশিক্ষা যেমন সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি, কুশিক্ষা ও অব্যবস্থাপনা তেমনি জাতীয় দুর্দশা, ক্রমাবনতি ও ক্রম-ধ্বংসের চলিকাশক্তি– পারস্পরিক দুষ্টচক্র (ভিশাস সার্কেল)। প্রকৃত শিক্ষা সামাজিক ও জাতীয় উৎকর্ষ ও উন্নতিকে ত্বরান্বিত করে এবং কালক্রমে পারস্পরিক ক্রমোন্নতির মাধ্যমে জাতিকে শীর্ষে পৌঁছে দেয়। এভাবে শিক্ষার মাধ্যমে মানবসম্পদ গড়তে পারলে দেশকে ক্রমাগত সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ করা সম্ভব। শিক্ষা ও উন্নয়ন একে অন্যের পরিপূরক ও পরিপালক।

তিনটি বৈশিষ্ট্যের সম্মিলনে শিক্ষা হতে হবে– জীবনকেন্দ্রীক শিক্ষা; কর্ম বা পেশাকেন্দ্রীক শিক্ষা; এবং মানবিক গুণাবলী-জাগানিয়া শিক্ষা। মানুষ কীভাবে জীবন অতিবাহিত করবে, পরিবেশকে বুঝতে শিখবে, জীবনের ভালো-মন্দ চিনতে শিখবে, সমাজে চলতে শিখবে ইত্যাদি জীবনকেন্দ্রীক শিক্ষা। আবার মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে রুজি-রোজগার করে খেতে হয়; কাজ করা লাগে; একটা পেশায় নাম লেখাতে হয়, আকাঙ্ক্ষার বিকাশ ঘটাতে হয়– এজন্য পেশাকেন্দ্রীক শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষা দিয়ে মানুষের মধ্যে মানবিক গুণাবলীকে জাগিয়ে তুলতে হয়; নইলে মানুষ আর মানুষ থাকে না– অন্য প্রাণির পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়, সমাজ ও রাষ্ট্র জঙ্গলে পরিণত হয়, তাই মানবিক গুণের উদ্রেককারী শিক্ষা মানুষের জন্য প্রয়োজন। আর যা-ই হোক, মানুষের মধ্যে এই তিন বৈশিষ্ট্যের শিক্ষা না থাকলে মানুষ 'মানুষের মতো মানুষ' হয় না। সমাজ অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় ভরে যায়।

অশিক্ষা এবং নিরক্ষরতা এক কথা নয়। শিক্ষিত লোকের মধ্যে যে যে উপাদান থাকা প্রয়োজন– সেগুলোকে শিক্ষার ভিত্তিমূল বলে গণ্য করা যায়, সেগুলোকে 'শিক্ষায় সাত আর' (Seven Rs in Education) বলতে পারি। এ সকল উপাদানের ধারক ও বাহক হলে তাদেরকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় বা দেশে মানবসম্পদ তৈরি হলো বলে বিবেচনা করা যায়। এগুলোকে এভাবে লিখছি:

১. পড়া (Reading): শিক্ষাসাধক রোমান চার্চের সেন্ট অগাস্টিনের কনফেশনস থেকেই শিক্ষার জন্য যে তিনটি 'আর'-এর ধারণা ('learning to read, and write, and do arithmetic') পাওয়া যায় তাদের একটা হচ্ছে পড়া। পড়তে পারাকে শিক্ষার প্রথম সোপান হিসেবে ধরা হয়।

২. লেখা ((W)Riting): লেখা ভাব প্রকাশের অন্যতম একটা বলিষ্ঠ মাধ্যম। শিক্ষায় লেখা আছে বলে সভ্যতা টিকে আছে।

৩. গণিত ((A)Rithmatic): অঙ্কের ধারণা ছাড়া সংখ্যাত্মক হিসাব গণনা অসম্ভব। গণিত ও বিশ্লেষণের বিভিন্ন শাখা ছাড়া বিশ্ব কর্মকাণ্ড অচল। আমাদের মস্তিষ্কের বিকাশ ও বিশ্লেষণমূলক কাজে গণিত বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাই শিক্ষায় গণিত অচ্ছেদ্য।

এই তিনটি যোগ্যতার অস্তিত্ব শিক্ষিত লোকের মধ্যে থাকতেই হয়। কিন্তু আদিকালের এই তিনটি উপাদান দিয়ে বর্তমান যুগের শিক্ষার মাপকাঠি বানালে চলে না। শিক্ষা আরো ব্যাপক একটা বিষয়। এ তিনটা উপাদানের বাইরেও কিছু যোগ্যতা বা গুণাবলি একজন শিক্ষিত লোকের মধ্যে থাকা প্রয়োজন।

৪. ধর্ম (Riligion): সেই আদিকাল থেকেই মানবজাতিকে এ ভূ-পৃষ্ঠে টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্ম মানুষের কাজেকর্মে, চিন্তা-চেতনায় সুস্থ মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন করে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করার সুবিধা দিয়ে আসছে। ধর্ম (ধৃ+ মন) মানে মানুষের মন 'মূল অনুমান' (আন্ডারলাইং এজামশন)-এর উপর ভিত্তি করে যে ধারণা (বিশ্বাস) ধারণ করে

রাখে। পৃথিবীর এমন কোনো ধর্ম নেই, যার মূলমন্ত্র ও অবস্থান মানবতার বিরুদ্ধে। ধর্ম খারাপ কাজের একটা অন্তর্নিহিত বাধা। ধর্মবিশ্বাস এমনই একটা মনের বিশ্বাস ও স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ যে, তা পালনে কোনো আইনের প্রয়োগ লাগে না। ধর্ম স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি দায়বদ্ধতা ও কর্তব্য পালন ছাড়া আর কিছুই না। শিক্ষায় ধর্মের গুরুত্ব অনস্বীকার্য ও অবিচ্ছেদ্য। শিক্ষাকে ধর্মবিচ্যুত করার কোনো অবকাশ নেই। ধর্মহীন শিক্ষা এবং স্টিয়ারিং ছাড়া যানবাহন একই কথা। ধর্ম মানুষকে অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে শেখায়। একমাত্র ধর্মই পারে শিক্ষায় সততা ও আদর্শ দিতে। নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা মানুষের মানবতাবোধকে সুশোভিত করে।

বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে সিএসআর, কোড অব কর্পোরেট গভর্নেন্স, প্রফেশনালস কোড অব এথিক্স, বিজনেস এথিক্স ইত্যাদি অনেক কোর্স চালু করা হয়েছে। এগুলো ধর্মেরই আংশিক প্রতিস্থাপন। মৌলবাদী হবার ভয়ে মূলকে বাদ দিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও আইন ও নিয়ম আকারে ভিন্ন নামে এগুলো চালু করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু মনের ভিতরে নৈতিকতার প্রশিক্ষণের বীজ প্রথিত না-হয়ে থাকার কারণে সব মুখস্থবিদ্যা কাগুজে-বাঘ হয়ে দেখা দিচ্ছে।

৫. গবেষণা/অনুসন্ধান (Research): বুদ্ধিমান প্রাণি বলে জন্মাবধি মানুষ অনুসন্ধানী। অনুসন্ধান মানুষের জিজ্ঞাসু মনের পিপাসা মেটায়। আরো কোনো বিষয়ে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করে। বার বার মানুষ একই ঘটনা শুনতে শুনতে, দেখতে দেখতে মনের অজান্তেই কোনো একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই গবেষণা। কোনো বিষয়ে অনুসন্ধান অধিক শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করে। যে শিক্ষায় গবেষণা নেই, মনে মনে ভাবনা নেই– সে শিক্ষা অচল ও ভঙ্গুর। গবেষণাহীন বা অনুসন্ধানবিহীন শিক্ষা স্রোতহীন মজা-দুর্গন্ধময় জলাশয়ের শামিল। অনুসন্ধান সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে।

৬. জাগ্রত বিবেক ও মূল্যবোধ (Roused-conscience and Values): বিবেক মানুষকে পশুধর্মী কার্যকলাপ থেকে পৃথক করেছে। শিক্ষায় মানুষের বিবেকবোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে। অন্য কথায়, বিবেকবোধ-রহিত কোনো মানুষকে শিক্ষিত বলা যায় না। শিক্ষিত মানুষ জাগ্রত-শাণিত বিবেকের অধিকারী হতে হবে। বিবেকহীনতা ও মনুষ্যত্বহীনতা থেকে সকল অন্যায় ও অবিচারের জন্ম। মানুষের মনের অন্ধকার ও অজ্ঞতাকে দূরীভূত করে তার মধ্যে সুবিচারের ক্ষমতা ও বোধশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে, যাতে মানুষ নিজের কর্মকে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই তা সম্ভব। চলার পথে মূল্যবোধ ও বিবেক অনেকটাই একে অন্যের পরিপূরক। মূল্যবোধ আমাদের ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে শেখায়। মূল্যবোধ মানসিক বিকাশের সহায়ক এবং সামাজিক অবক্ষয়-রোধক। এ দেশের শিক্ষা এবং বিভিন্ন প্রকার দেশীয় শাশ্বত মূল্যবোধ সুষ্ঠু ও বিকশিত স্বাতন্ত্র্য জাতি গঠনের পরিচায়ক। দেশীয় মূল্যবোধ দেশাত্মবোধের জন্ম দেয়। তাই শিক্ষিত মানুষ দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত। মূল্যবোধ জাগ্রত বিবেককে নাড়া দেয়; মিথ্যার সাথে চলতে নিষেধ করে; অন্যায়ের কাছে মাথা নত না-করতে শেখায়।

৭. ন্যায়নিষ্ঠা (Righteousness)**:** ন্যায়নিষ্ঠা শব্দটা অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ন্যায় অর্থ– নীতি, যুক্তি, যথার্থ, সত্য, সুবিচার– যা সত্যে নিয়ে যায় প্রভৃতি। নিষ্ঠা অর্থ– দৃঢ় অনুরাগ, আস্থা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি, মনোযোগ, দৃঢ়স্থিতি প্রভৃতি। ন্যায়নিষ্ঠা হলো ন্যায়পরায়ণতা, সাধুতা, পবিত্রতা, ধার্মিকতা, সততা ইত্যাদি। সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে হলে যে কয়টা গুণ অবশ্যম্ভাবী তার একটা ন্যায়নিষ্ঠা।

উল্লিখিত এ উপাদান বা গুণগুলো যত বেশি মানুষের মধ্যে শিক্ষার মাধ্যমে জাগিয়ে তোলা যায়, ততই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ। এ ভিত্তিমূলগুলো শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হলেই তাকে শিক্ষিত বলবো। এভাবে শিক্ষিত মানুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আদর্শ-জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। বিষয়গুলো পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও উত্তরোত্তর বর্ধিষ্ণু।

এখন এ ভিত্তিমানগুলো এবং আনুষঙ্গিক অন্য বিষয়গুলো নিয়ে কীভাবে সুশিক্ষিত সমাজ, জাতি ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব তা নিয়ে কথা বলবো।

কেউ কেউ উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর মানসিক উন্নয়নের কথাকে নিছক কাগুজে তত্ত্ব বলে উপেক্ষা করতে চান। অথচ একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করা যায় এবং সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব হয়। প্রথমেই একটা মডেলের দিকে আমরা দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করতে পারি।

শিক্ষা এবং সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়ন মডেল

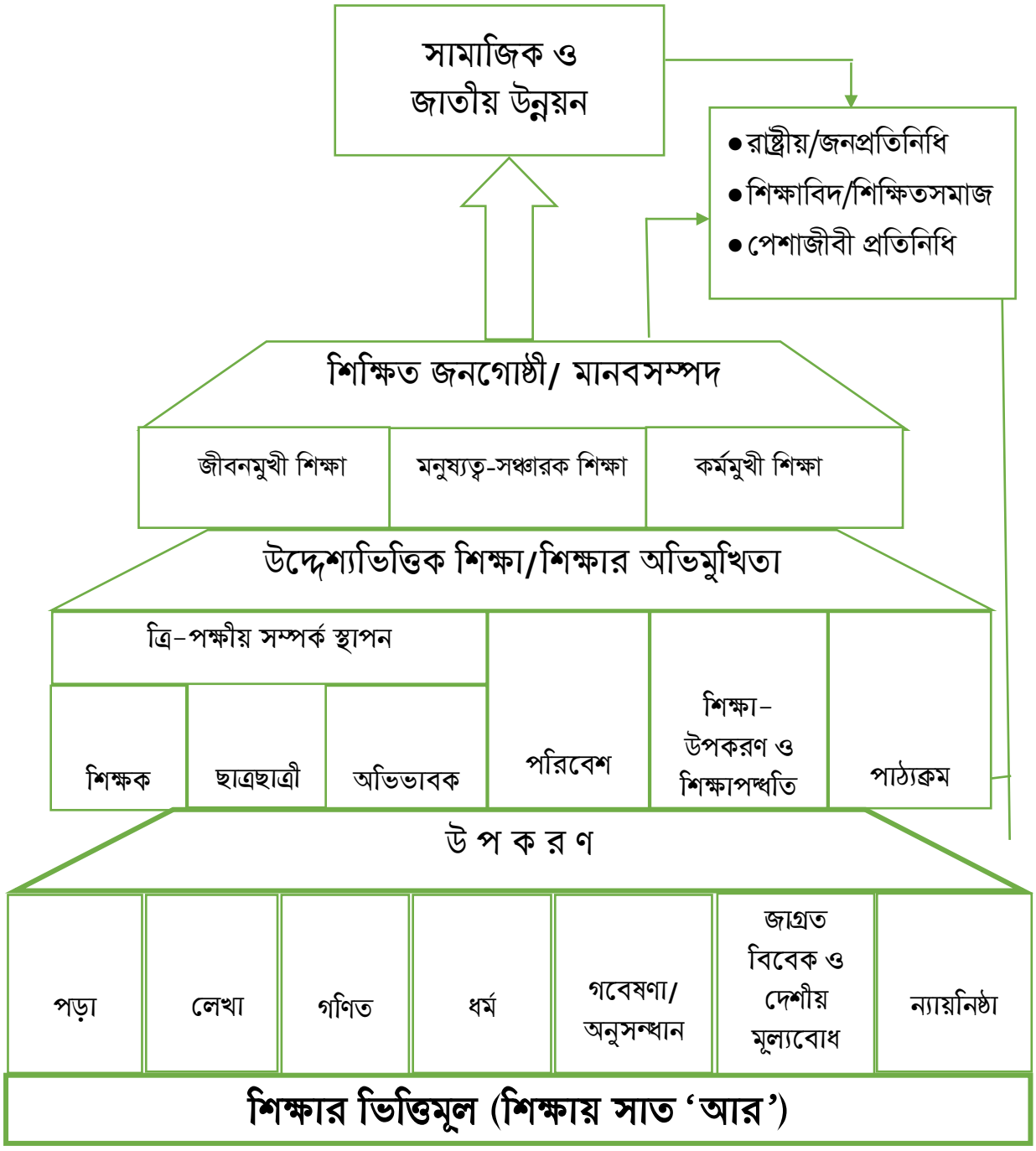

শিক্ষার ভিত্তিমূলকে ছয়টা উপকরণ প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বা মানবসম্পদে পরিণত করা যায়। শিক্ষার্থী নিজেও শিক্ষার অন্যতম উপকরণ।

প্রথমেই আসে শিক্ষকের কথা। শিক্ষক ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অচল। তাই শিক্ষার জন্য আদর্শ শিক্ষকের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। ভিশাস্ সার্কেলে পড়ে এ-সংখ্যা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। যোগ্য-নীতিবান ব্যক্তিদের এ পেশায় আনার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকদের পারিশ্রমিকের দিকটাও বিবেচনায় আনতে হবে। লেখাপড়া জানা সুশিক্ষিত লোক যাতে এ পেশায় আকৃষ্ট হন, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। নির্ধারিত মান, ভালো পরিবেশ, নীতিবান শিক্ষক– আশানুরূপ ফলাফল, একথা মানতে হবে।

আজকের শিক্ষার্থী শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনের প্রকৃত মানুষ। তাদেরকে সুশিক্ষা দিয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়া আমাদের দায়িত্ব, রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অন্যথায়, রাষ্ট্রে অমানুষের সংখ্যা সীমার বাইরে ছাড়িয়ে গেলে রাষ্ট্রীয় দুর্বৃত্তায়নের ফলে নিজেরাই নিজেদের রাষ্ট্রকে গিলে খায় কিংবা রাষ্ট্রের নামটা নামমাত্র থাকলেও রাষ্ট্রময় বুনো আবহে অসুরকুলে সুর তোলে। এখানেই শিক্ষা ও দেশপ্রেমের গুরুত্ব। ছাত্রছাত্রী মূল উপকরণ, বাকিগুলো কনভার্শন প্রক্রিয়া। তবে এ দেশে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া নিয়ে ধারণা মানসম্মত নয়। দীর্ঘদিন অব্যবস্থাপনার মধ্যে থেকে এবং সস্তা জনপ্রিয়তার পিছনে ছুটতে গিয়ে শিক্ষা-মানের এই অবনতি। শিক্ষার মান নামানো যত সহজ, বাড়ানো বেশ কঠিন। শিক্ষকরা প্রতিটি শ্রেণির জন্য ত্রিপক্ষীয় 'শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক' সম্বন্ধ (ট্রাই-পর্টাইট রিলেশনশিপ) তৈরি করবেন। তাঁদের সাথে নিয়মিত বসবেন। অভিভাবককে সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীর পারফরমেন্স জানাবেন। প্রয়োজনে অভিভাবককে মোটিভেট করবেন, ছাত্র/ছাত্রীর উন্নয়নে এগিয়ে আসতে বলবেন। শিক্ষা প্রশাসন অভিভাবক ট্রেইনিংয়ের অবশ্যই ব্যবস্থা করবে। প্রতিটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে অভিভাবকমহলের প্রত্যক্ষ, আন্তরিক এবং সক্রিয় যোগাযোগ-ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় অভিভাবকদের সহযোগিতা ছাড়া শুধু শিক্ষকের একার পক্ষে ছাত্র/ছাত্রীর শিক্ষাদান সম্ভব নয়। অভিভাবকদের বোঝাতে হবে– পারিবারিক শিক্ষা ছাত্রছাত্রীর জীবনে অনেকটাই প্রভাব বিস্তার করে, যা এ দেশের যান্ত্রিক জীবনে প্রায় বিলীন হতে চলেছে। মূল কথা, এ দেশে শিক্ষার পরিবেশের বড় অভাব। সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ শিক্ষার উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। সেজন্য 'মহান রাজনীতিবিদ'দের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মুখের দিকে চেয়ে হলেও অন্তত শিক্ষাঙ্গন নিয়ে রাজনীতির ব্যবসাটা বন্ধ করতে হবে। এ দেশে এমন কোনো জেলা, উপজেলা, গঞ্জ নেই যেখানে কিশোর গ্যাংয়ের অস্তিত্ব নেই। পত্রিকার পাতা খুললেই প্রতিনিয়ত চোখে পড়ে কিশোর গ্যাং ক্রমেই বিস্তার লাভ করছে। কিশোর গ্যাংয়ের দলীয় গডফাদাররা পর্দার অন্তরালে থেকে পুতুল নাচাচ্ছে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, নেশা, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি এর প্রধান কারণ। এজন্য আইনের শাসন দরকার। আজকের দুর্বৃত্ত-কিশোরই বড় হচ্ছে, সমাজের কাজে অংশ নিচ্ছে। রাজনীতির সামাজিক দুর্বৃত্তায়ন ও আইনহীনতা, কিংবা আইন প্রয়োগে ডাবল-স্ট্যান্ডার্ড দেশের সুন্দর-শান্ত সামাজিক পরিবেশকে ক্রমশই ধ্বংস করে দিচ্ছে। শিক্ষার পরিবেশও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ছোটবেলায় দেখেছি, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন স্কুল থেকে শিক্ষার্থীদের বোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান করে নিতে। চাকরিতেও তাঁরাই বড় বড় পদে গেছেন। স্কুলে নীতিবান শিক্ষকেরা ছিলেন, শক্ত মেরুদণ্ডসম্পন্ন হেডমাস্টার ছিলেন। এখন সেখানে দলবাজদের অবাধ বিচরণ আর শিক্ষকদের টিউশনির রমরমা ব্যবসা। ভাবী আত্ম-ধ্বংসস্তূপের উপরে দাঁড়িয়ে অলীক জয়কীর্তন গেয়ে সুরধ্বনিতে চারপাশ ভাসিয়ে দিই।

রাজনীতিবিদদের পোষা পোকা-ধরা, বখাটে-মাস্তান পাড়া-মহল্লা-গঞ্জে যত প্রকার অসামাজিক অকাম-কুকাম আছে তা করছে আর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কোথাও দেখার কেউ নেই! বাধা দিলেই আপনার জীবন ও জীবনী দুটোই শেষ। শিক্ষার পরিবেশ, মানুষের মতো মানুষ হবার স্বপ্ন, নীতিকথা, সামাজিক ন্যায়বিচার অশুভ শক্তির প্রচণ্ড দাপটে, ভয়ে উধাও হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেছে। অনেক অভিভাবককে বলতে শুনেছি, তাঁরা খারাপ পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার কারণে ছেলে-

মেয়েদের শিক্ষার কাজে ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছেন। শিক্ষার সামাজিক উপকরণ কোথায়! সামাজিক পরিবেশকে খারাপ করে দিয়ে এককভাবে শিক্ষার উন্নয়ন হয় না।

ম্যানেজিং কমিটি বর্তমান শিক্ষাঙ্গনে গাঁড়ের উপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। রক্ষক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভক্ষক। স্থানীয় রাজনীতির নেতারা কমিটিতে ঢুকছে, আর বিশ্রী দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। মাদ্রাসাছাত্রী নুসরাত জাহান রাফি হত্যাকাণ্ডের মতো আরো শতেক ঘটনা যখন প্রকৃতির অনিবার্য কারণে সামনে বেরিয়ে আসে, তখনই আরো আরো শত-সহস্র শিক্ষাঙ্গনের দুর্নীতির প্রখর-তেজদীপ্ত আলোয় চোখে ঝাপসা দেখি।

প্রযুক্তিগত পরিবেশ ছাড়া বর্তমান ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্র-সভ্যতা অচল। বর্তমান কর্মের হাতিয়ার প্রযুক্তি। যে সমাজে প্রযুক্তির ব্যবহার যত বেশি, সে সমাজ তত সমৃদ্ধ। শিক্ষাঙ্গনে যেখানে যতটুকু দরকার প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে ও শেখাতে হবে।

শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পরিবেশ একটা বিষয়। এ দেশের অধিকাংশ স্কুল-মাদ্রাসাতে গণহারে শ্রেণিকক্ষে বসিয়ে অগণিত ছাত্রছাত্রীকে একসাথে দায়সারা পাঠদান করা হয়। এভাবে চলতে চলতে হাউস-টিউটরের কাছে পড়া বাধ্যতামূলক ও অবশ্যম্ভাবী একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে বা বলা যায় হাউস-টিউটরের ভূমিকা স্কুলে পড়ার তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। এ সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে স্কুলের পড়া স্কুলেই শিখিয়ে দিতে হবে। ছাত্রছাত্রীকে স্কুলে বেশি সময় ধরে রাখতে হবে। পড়া আদায় করে নিতে হবে। এতে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসশিক্ষায় মনোযোগী হবে এবং হাউস-টিউটরের প্রতি নির্ভরতা ক্রমশই কমবে। শিক্ষকরা চলমান ইন-ক্লাস ইভ্যালুয়েশনের উপর বেশি জোর দেবেন; ক্লাসে পড়াবেন, শেষে ছোট্ট করে একটা পরীক্ষা নেবেন। মোট নম্বরের মধ্যে চলমান ইন-ক্লাস ইভ্যালুয়েশনের ভার বেশি রাখবেন। অর্ধবার্ষিকী কিংবা বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের সাথে চলমান ক্লাসরুম ইভ্যালুয়েশন বছরান্তে তুলনা করবেন। এতে শিক্ষকের কৃতকর্ম ও দুর্বলতাও বের হয়ে আসবে।

সরকার থেকে আরবি, কোরআন-হাদিসসহ কওমি মাদ্রাসাতেও যদি সাধারণ স্কুল-কলেজের মতো বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি কোর্সের পাঠদান বাধ্যতামূলকভাবে করতে হবে। সরকার ইচ্ছে করলেই এগুলো পারে। একটা বিষয় সত্য যে, আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসার মৌলভি-মাওলানাদের যদি শুভবুদ্ধির উদয় হয়, জীবনের বাস্তবতা যদি বুঝতে পারেন, প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রী-সমাজের বড় একটা অংশের মেধাকে যদি অঙ্কুরে বিনাশ না করে দিয়ে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ করে দেন এবং সাধারণ স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সাথে সুস্থ প্রতিযেগিতায় নামেন, আমি নিশ্চিত তাঁরা এতে সার্থক হবেন। অভিন্ন সিলেবাস এবং বোর্ড-প্রশ্নে সকল স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার পরীক্ষা হবে। এতে মাদ্রাসা শিক্ষার মান নিয়ে জনমনে যে অবমূল্যায়নের মানসিকতার জন্ম নিয়েছে, তা দূরীভূত হবে। মানসিকতার সুষ্ঠু উন্নয়ন মানেই প্রতিটা ক্ষেত্রের উন্নয়ন। তাঁদের সুমতির উদয় হোক এটা আমার প্রত্যাশা।

শুভবুদ্ধির উদয় সরকারেরও হতে হবে! কারণ দেশে মাদ্রাসা যে হারে বাড়ছে, বৃহৎ একটা জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষেত্রে অনুৎপাদনশীল ও বেকার কিংবা ছদ্ম-বেকার রাখাটা আদৌ উচিত হবে না। তাদেরও ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, সমাজসেবক, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বায়োলজিস্ট প্রভৃতি শত-শত উচ্চতর পেশায় যাওয়ার পথ করে দিতে হবে। হেফজখানাগুলোতেও কোরআন হেফজের পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে থাকতে হবে এবং হেফজ পড়া অবস্থায় ষষ্ঠ শ্রেণিতে মূল স্রোতধারায় এসে মিশে যেতে হবে। আমাদের দেশের মতো এতো বহুমুখী হ-য-ব-র-ল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা অন্য কোনো দেশে আছে বলে আমার জানা নেই। ব্রিটিশ আমলে মুসলমানদের পুরোহিতরা (মৌলভি ও মাওলানারা) বাংলা, ইংরেজি, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞানকে পরিহার করে শুধু আরবিভিত্তিক যে শিক্ষাব্যবস্থা ও পরিবেশ এ উপমহাদেশে চালু করেছিলেন, বর্তমান বাঙালি মুসলমানরা জাতি হিসেবে সে অদূরদর্শিতার কুফল এখনো বয়ে বেড়াচ্ছেন।

দেশেও মাদ্রাসা শিক্ষার নামে একটা পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী আধুনিক সমাজব্যবস্থায় তৈরি হচ্ছে। ইসলামি জ্ঞানসমৃদ্ধ উচ্চশিক্ষা পেলে এরাও জাতির ভবিষ্যৎ হিসেবে পরিগণিত হতো। উন্নত জাতি গঠনে ধর্মীয় আবেগপ্রবণতার কোনো স্থান নেই। সামগ্রিক শিক্ষার উন্নয়নে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের যদি নানামুখী উচ্চশিক্ষা দেওয়া যায়, সাথে সাথে মাদ্রাসার প্রয়োজনীয় অংশ যদি সাধারণ স্কুল-কলেজের শিক্ষার পাঠ্যক্রমের মধ্যে এখনিই ছড়িয়ে দিয়ে পুরো বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে মুসলমানি-বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক বানানো যায়, তাহলে তা হবে এ উপমহাদেশে বাঙালি মুসলমানদের পুনর্জাগরণ, জাতির টিকে থাকার অবলম্বন, এ-দেশ উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছানোর সোপান।

অধিকন্তু মুসলমানি মাজারতত্ত্ব, পিরতত্ত্ব ও পুরোহিতবাদের অবসান; মুসলমান ধর্মের উদারনৈতিক বৈশিষ্ট্য, সাম্যের বাণী, শিক্ষা ও গুণাবলিকে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। আমরা ইসলামিক স্কলার তৈরি করতে চাই– আপাদমস্তক কুসংস্কারে ভরা কবরপূজক-পির, নাচুনে-পির ও তাদের দিগ্‌ভ্রান্ত শাগরেদবর্গ দেখতে চাই না। মাওলানা-মৌলভিরা দেশের শত্রু নয়, তাঁরাও এদেশের সম্মানিত নাগরিক–এটা বুঝতে হবে। তাঁদেরকে উচ্ছেদ করতে হবে, ধ্বংস করে ফেলতে হবে, ঘৃণা করতে হবে, দূরে ঠেলে দিতে হবে, শুধু রাজনীতির কাজে ব্যবহার করতে হবে– এটাও কাম্য নয়।

তাঁদের বিশ্ব-ইতিহাস শিখতে হবে; বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, প্রযুক্তিবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান পড়তে হবে; নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বন্ধ করতে হবে; কথা ও কর্মে উদারতা বাড়াতে হবে; ধর্মব্যবসা ছাড়তে হবে; ধর্ম ছাড়াও একটা জীবনমুখী কাজকে পেশা হিসেবে নিতে হবে; জনগোষ্ঠীর মূল স্রোতধারায় মিশে যেতে হবে; সৃষ্টির সেবা করতে হবে– এটা কাম্য।

দেশ হতে হবে ধর্ম-বিভেদহীন, প্রতিহিংসামুক্ত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার্থীরাও নিজ নিজ ধর্ম, মানবতা, সহনশীলতা, সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা একই সাথে স্কুলে শিখবে, চর্চা করবে, সমান তালে এগিয়ে যাবে। প্রতিটা ধর্মেরই মূল কথা যেহেতু ধর্মীয় অহিংসতা, যার যার ধর্ম তার তার, ধর্মে কোনো বাড়াবাড়ি নেই; তাই দেশ হবে অহিংস ধর্মের দেশ। এ দেশ সকল ধর্মের, সম্প্রদায়ের, গোষ্ঠীর জন্য সমান। রাষ্ট্রের কাছে সকল ধর্ম সমান। এ-মন্ত্র ও শিক্ষা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের উন্নয়ন ও উৎকর্ষের মূলমন্ত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। জনগোষ্ঠীর আত্মিক ও মানসিক কাঠামোর উন্নতি হলে তার সুপ্রভাব রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলেও পড়বে। এভাবে মডেলে উল্লিখিত শিক্ষার উপকরণের ক্রমোন্নতি হবে। ক্রমোন্নতি হবে শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠ্যক্রমেরও। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী হবে সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি।

(২২ আগষ্ট ২০২২, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

প্রফেসর ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক